গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা | ১৪ - ২০ এপ্রিল ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি
মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক

কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

৫ আগস্ট ২০২২ - ৫ আগস্ট ২০২৩

সমস্ত আদর্শেরই মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে

শিবদাস ঘোষ

মনে রাখবেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হোক, আর যে কোনও আদর্শবাদই হোক, শুধু কতকগুলো কথার মধ্যে কোনও আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে না। যে কোনও আদর্শের আসল পরিচয় বা মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত, নীতিগত এবং রুচিগত মানের মধ্যে। না হলে বই পড়ে বড় বড় রাজনীতির কথাগুলো যে কোনও 'মিডিওকার' পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারে এবং সেগুলো বলতে পারে। তাই মার্ক্স থেকে শুরু করে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ পর্যন্ত বা যাঁরাই হাতেকলমে বিপ্লব করেছেন, সকলেই একটা কথার উপর জোর দিয়েছেন, তা হচ্ছে, কোনও আদর্শ বড় হলেই তাকে বাস্তবে

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপির সাম্প্রদায়িক কোপদৃষ্টি ইতিহাসে

স্কুলপাঠ্য থেকে বাদ মুঘল আমল

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকার জানিয়েছে, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)-র পরামর্শ মেনেই দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে মুঘল অধ্যায় বাদ দেওয়া হয়েছে যা আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে। এনসিইআরটি-র পরামর্শেই দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে 'থিমস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, পার্ট টু' এ 'কিংস অ্যান্ড ক্রনিকল ঃ মুঘল কোর্ট' অধ্যায়টি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই নির্দেশ কার্যকর হলে সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের আর মুঘল ইতিহাস পড়ার প্রয়োজন থাকবে না। ইতিপূর্বে মুঘল আমলে গড়ে ওঠা বহু ঐতিহাসিক শহর ও স্থানের নাম উত্তরপ্রদেশ সরকার বদলে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও দিল্লির মুঘল গার্ডেন্সের নাম পরিবর্তন করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর নানা বক্তৃতায় বার বার ইতিহাস নতুন করে লেখার কথা বলে আসছেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি ইউজিসি-র পক্ষে ইতিহাসের যে সিলেবাস প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ইতিহাস বিকৃতির ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ফলে এনসিইআরটি-র সুপারিশ মেনে এই বদল হয়েছে বলে ছেলেভোলানো হাস্যকর যুক্তির আড়ালে তাদের গভীর পরিকল্পনাটি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আসলে তারা এনসিইআরটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সুপরিকল্পিত চক্রান্ত আড়াল করার চেষ্টা করেছে মাত্র।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তক থেকে এভাবে মুঘল ইতিহাস বাদ দিলেই কি ইতিহাসের তিনশো বছরের বেশি সময়কে (১৫২৬-১৮৫৭) মুছে দেওয়া সম্ভব? যদি একটি যুগের সবকিছুই কদাকার, অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকেও থাকে তা হলেও কি সেই সময়ের ইতিহাসকে মুছে দেওয়া যায়? ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সময়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে ইতিহাসে পড়ানো হলেও সামগ্রিক ইতিহাস চর্চা থেকে ওই সময়কে

তিনের পাতায় দেখুন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের সামনে ডিএসও-র বিক্ষোভ

জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসারী ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স ও ৮২০৭টি স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার হরণে সেগুলির আর্থিক হিসেবনিকেশে রাজভবনের নজরদারির প্রতিবাদে ১০ এপ্রিল এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এ দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে রাজ্যপাল উপস্থিত হলে তাঁর সামনে এআইডিএসও-র কর্মী-সমর্থকরা প্রবল বিক্ষোভ দেখায়।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ধ্বংস করতে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সংশোধনী

তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, গত ৬ এপ্রিল বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তথ্যপ্রযুক্তি (ইন্টারমিডিয়ারি গাইডলাইন্স অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড) আইন, ২০২১-এর যে সমস্ত সংশোধনী ঘোষণা করেছে, আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি। এর ফলে কোনও সংবাদ ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর কিনা, তা নির্ধারণ করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চলে যাবে সরকারের হাতে। এই সংশোধনীর ফলে সংবাদ যাচাইয়ের একমাত্র অধিকার পেতে চলেছে সরকার মনোনীত একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি 'ভুয়ো অথবা মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর' তা যাচাই করা এবং 'ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার', 'সোশ্যাল মিডিয়া রেগুলেটর' ইত্যাদির মতো মধ্যস্থতাকারীদের এই তথ্য ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপক ক্ষমতা থাকবে। জানা গেছে, প্রেস ইনফর্মেশন বুরো থেকে এই তথ্য-পরীক্ষক গোষ্ঠী তৈরি করা হবে। ফলে সেটি সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। একটি সরকারি গোষ্ঠীর হাতে অনলাইন তথ্যগুলির সত্যতা যাচাইয়ের এরকম অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হলে ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয় এবং আইনের চোখেও তা সঠিক হতে পারে না। স্পষ্টতই সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নির্লজ্জভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এ হল কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া আরও এক স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ। বাস্তবে, শাসক বিজেপির বিরুদ্ধেই অভিযোগ রয়েছে যে তারা নিজেদের স্বার্থে তাদের কুখ্যাত আইটি সেলের মাধ্যমে কখনও সাম্প্রদায়িকতার আগুন লাগাতে, কখনও বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সরকারবিরোধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করতে ভুয়ো সংবাদের বন্যা বইয়ে দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করছে।

বিরোধী স্বর বা সমালোচনার কণ্ঠ রোধ করতে বিজেপি সরকারের এই স্বৈরাচারী পদক্ষেপের আমরা পুনরায় তীব্র নিন্দা করছি এবং সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ সহ বিবেকবান সাংবাদিক, আইনজীবী ও সমস্ত অংশের বুদ্ধিজীবীদের প্রতি এই ভয়াবহ পদক্ষেপের দৃঢ় প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।

২৪ এপ্রিল

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর
৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

সমাবেশ

বক্তাঃ- কমরেড প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক

সভাপতিঃ- কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য
পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক

শরৎ সদন, হাওড়া, বিকেল ৪ টা

SUCI
COMMUNIST

আধার ও প্যান লিংকের নামে
জনগণের পকেট কাটছে মোদি সরকার

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নতুন লুঠের কারবার— আধার এবং প্যানকার্ড সংযুক্তির নামে হাজার টাকা জরিমানা। কখনও জিএসটি, কখনও পিএম কেয়ার ফান্ড, কখনও ওষুধের দাম বৃদ্ধি, কখনও পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জনগণকে লুটেই চলেছে মোদি সরকার।

আধার-প্যান যুক্ত করতে কি সরকারের কোনও খরচ হয়? একেবারেই না। তবে কেন জরিমানার নাম করে হাজার হাজার টাকা লুটে নিচ্ছে সরকার? তা ছাড়া এই যুক্তিকরণ প্রশাসনের সুবিধার জন্য সরকার করতে বলছে। জনসাধারণের বিশেষ প্রয়োজনে তা করা হচ্ছে না। তা হলে এখানে জনসাধারণের থেকে টাকা নেওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন? এই প্রশ্ন তুলেই দেশ জুড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে সাধারণ মানুষ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেছেন, তাড়াতাড়ি সংযোগ করুন, না হলে আরও বেশি জরিমানা দিতে হবে। সরকারের কর্তারা জনসাধারণকে কী চোখে দেখেন মন্ত্রীর এই বক্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট। মানুষের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকলে এমন কথা কেউ বলতে পারে!

সরকার বলছে, আমরা ২০২২-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত লিংকের জন্য সময় দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশই ওই সময়ের মধ্য তা করেনি। সেই কারণেই এই জরিমানা। কিন্তু সরকারের কথাতেই স্পষ্ট দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে এই কথা আদৌ পৌঁছায়নি। সাধারণ মানুষ যদি জানত, তারা কি জরিমানা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করত? কোটি কোটি মানুষের বিষয় যেখানে যুক্ত শুধুমাত্র একটা সরকারি সার্কুলার দিয়েই সেখানে সরকার দায় সারতে পারে কি? মানুষকে বিপদে ফেলার মধ্য দিয়ে লুঠের পথ খোলাটাই উদ্দেশ্য না হলে সরকার সঠিকভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। নিবিড় প্রচার করত। সেটা করেনি কি টাকা লোটার সুযোগ করে নেওয়ার জন্যই?

মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে দিন আনা-দিন খাওয়া অসহায় হতদরিদ্র মানুষগুলি একদিকে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হচ্ছে লিংক করানোর জন্য, অপর দিকে গাঁটের কড়ি খরচ করে আরও পথে বসছে। বর্তমানে যে কোনও কারণে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে আধার-প্যান বাধ্যতামূলক। কোনও ছাত্র যদি স্টুডেন্টস লোন নিতে চায়, ছাত্রদের জন্য যেটুকু ভাতার ব্যবস্থা আছে, অসহায় মানুষদের জন্য ছিটেফোঁটা যতটুকু সরকারি ভাতার ব্যবস্থা আছে, যেমন বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি, একশো দিনের কাজের টাকা পেতে হলে, মিড ডে মিল কর্মী, আশা কর্মীর মতো স্কিম ওয়ার্কারদের যৎসামান্য মাইনের টাকাটুকু তুলতে হলে বা আর পাঁচটা নানা প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতেই হয়।

সাতের পাতায় দেখুন

আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে

একের পাতার পর

রূপায়িত করা যায় না, যদি সেই আদর্শকে রূপায়িত করবে যে মানুষগুলো তারা সেই আদর্শকে রূপায়িত করবার মতো বড় মানুষ এবং উন্নত চরিত্রের না হয়। তাই মার্ক্সবাদী আন্দোলনে ডি-ক্লাসড রেভোলিউশনারি বা প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাঁরা এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই মাও সে-তুঙকে বলতে শুনি— কেউ মার্ক্সবাদ বুঝেছেন কি না এবং তত্ত্ব ও কর্মের সংযোজন ঠিক মতো করতে পেরেছেন কি না, তার প্রমাণ তিনি কত বই পড়েছেন বা কত বই লিখেছেন তাতে নেই বা তার প্রমাণ কত স্লোগান তিনি দিয়েছেন এবং কত জেল তিনি খেটেছেন তাতেও নেই। তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে, তিনি উন্নত সংস্কৃতি এবং উন্নত নৈতিক বলের অধিকারী হয়েছেন কি না। ইয়েনানের স্কুলে পার্টির নেতা ও কর্মীদের কাছে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেছেন। বলেছেন, কারওর মধ্যে মার্কসবাদের উপলব্ধি ঠিক মতো ঘটেছে কি না, তা বোঝবার এইটিই একমাত্র কষ্টিপাথর। অথচ আমাদের দেশের মার্ক্সবাদী আন্দোলনে এই কষ্টিপাথরটির উপরে আমরা একেবারে জোর দিই না। বামপন্থী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন এ দেশে দীর্ঘদিন শুরু হওয়া সত্ত্বেও এমন ভাবে তা যে বিপথগামী হল, তা যে বারবার নানা ধরনের সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ এবং শোধনবাদের খপ্পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ছে, এক ধরনের শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আর এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছে, বা এক ধরনের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আর এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছে, তার একটা প্রধান কারণ, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের এই মর্মবস্তুর দিকটিকে এখানে অবহেলা করা হয়েছে।

এ দেশের অনেক তথাকথিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের এমন কথাও বলতে শুনেছি যে, নীতিনৈতিকতা, আদর্শবাদ এগুলো সব নাকি বুর্জোয়াদের কুসংস্কার। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নাকি নীতিনৈতিকতা, আদর্শবাদ বলে কোনও জিনিস নেই। আমি কিন্তু এমনভাবে মার্কসবাদ বুঝিনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এমন বুঝলে আমি বহুদিন আগেই তা পরিত্যাগ করতাম। আমি বুঝেছি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে এ যুগের সবচেয়ে উন্নত মানের আদর্শবাদ। এর মধ্যেই রয়েছে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিনৈতিকতার ধারণা, এর চেয়ে বড় আদর্শবাদ নেই। বুর্জোয়া মানবতাবাদের সঙ্গে, ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ বা ধর্মীয় মূল্যবোধে নীতিনৈতিকতার একটা শাশ্বত কাঠামো আছে— আর, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে যে নীতিনৈতিকতার ধারণা, জীবনসংগ্রামের দ্বারা তার রূপ ক্রমাগত পাল্টায়। বাস্তব অবস্থা এবং মানুষের যথার্থ প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর নীতিনৈতিকতার ধারণা পাল্টাতে থাকে। মানুষের এই যে যথার্থ প্রয়োজন, এটা কারও ব্যক্তিগত প্রয়োজনবোধ নয়। পরিবর্তনের যেটা যথার্থ প্রয়োজন, তার দিকে লক্ষ রেখে এর নীতিনৈতিকতার ধারণাগুলোরও ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন করে সমাজ পাল্টাচ্ছে, উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টাচ্ছে, মানুষের প্রয়োজনের উপলব্ধি বা প্রয়োজনবোধ পাল্টাচ্ছে, সংগ্রামের প্রক্রিয়া পাল্টাচ্ছে, শ্রেণিসংগ্রামের রূপ পাল্টাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক স্তর থেকে আর এক স্তর পর্যন্ত, তেমনই এর নীতিনৈতিকতার ধারণাও পাল্টাচ্ছে।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে নীতিনৈতিকতার ধারণা রয়েছে বৈকি এবং সেটা খুব উন্নত ধারণা, বুর্জোয়া মানবতাবাদের চেয়েও উন্নত ধারণা। তাই দেখবেন, মার্কস কমিউনিজমের কথা কেন বলেছেন, তা নিয়ে একদল তাঁকে একসময় প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, তাঁরা মনে করতেন, মানবতাবাদের চাইতে উন্নত আদর্শবাদ কিছু নেই। মার্ক্স তার উত্তরে তাঁদের বলেছিলেন, তাঁরা যে মানবতাবাদের কথা বলছেন, তা আসলে বুর্জোয়া মানবতাবাদ। আর, তিনি যে কমিউনিজমের কথা বলছেন, তাও মানবতাবাদই। কিন্তু কমিউনিজম হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে মুক্ত মানবতাবাদ। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি কথাটা শুধু বস্তুগত অর্থে তিনি বোঝাতে চাননি। অর্থাৎ বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা, আরাম-আয়েস, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, এই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধার, এটাকেই তিনি শুধু বোঝাননি। যারা তাঁর কথা ঠিকভাবে বুঝেছে, তারা জানে যে, তিনি এর দ্বারা এতদূর পর্যন্ত বলতে চেয়েছেন যে, এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যখন চলে যাবে বা কেউ ছেড়ে দেবে, তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে গড়ে ওঠা যে মানসিক ধাঁচা থেকে যাবে— অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বা প্রফেশনাল ইগোসেনট্রিসিজম-এর মধ্যে যার রূপ আমরা দেখতে পাই, তার থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে পারে যে মানবতাবাদ, সেই মানবতাবাদ হচ্ছে কমিউনিজম।

তা হলে ভারতবর্ষে এই সমস্ত তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টির যাঁরা নেতা, তাঁরা নিজেরা আগে কমিউনিস্ট হলে এবং এই কমিউনিস্ট নীতিনৈতিকতার অধিকারী হলে তবে তো অপরকে নেতৃত্ব দেবেন। তা এই সমস্ত তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতাদের অনেকেই বস্তুগত অর্থেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে আজও ছাড়তে পারেননি, সেখানে তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে উদ্ভূত মানসিক ধাঁচা থেকে নিজেদের মুক্ত করবেন কী করে? বিষয়টা এত সোজা নয়।

'বর্তমান পরিস্থিতি এবং গণআন্দোলনে প্রধান বিপদ'
— শিবদাস ঘোষ
২৪ এপ্রিল, ১৯৭৪-এর ভাষণ

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার রঘুনাথপুর শহর লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড মহাদেব বাউরি ২৩ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

গত কয়েক বছর যাবত শারীরিক অসুস্থতার কারণে সক্রিয়ভাবে দলের কাজ করতে না পারার একটা মানসিক যন্ত্রণা নিয়েই সবসময় দলের কাজকর্মের খোঁজ নিতেন। দলের নেতৃত্বের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আনুগত্য ও আস্থা।

কমরেড মহাদেব বাউরি ১৯৬০-এর দশকে বিড়ি শ্রমিকের কাজ করতেন। সে সময় হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিককে সংগঠিত করে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই আন্দোলনে তিনিও একজন সৈনিক ছিলেন। তৎকালীন সময়ে এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা নেতা প্রয়াত কমরেড ভাস্কর ভদ্র ও রঘুনাথপুর বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত কমরেড হরিপদ বাউরির সান্নিধ্যে এসে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। এরই ধারাবাহিকতায় নিজেকে তিনি দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলেন।

কমরেড মহাদেব বাউরি ছিলেন একজন শিল্পী। প্রথাগত পড়াশোনা না থাকলেও দেওয়াল লিখনে ছিলেন সুনিপুণ। কাগজে ছাপা অক্ষরের মতো পোস্টার লিখতেন। তৎকালীন সময়ে দলের বিভিন্ন কর্মসূচি প্রচারের মাধ্যম ছিল দেওয়াল লিখন ও হাতে লেখা পোস্টার। তিনি এই প্রচারমাধ্যমের গুরুত্ব হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন, তাই দল যেখানে পাঠিয়েছে সেখানেই ছুটে গিয়েছেন। বিড়ি শ্রমিকের সামান্য মজুরি থেকে ৫-৬ জনের সংসার প্রতিপালন করা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। অথচ অর্থের বিনিময়ে হোর্ডিং লেখার ডাক পেলেও তিনি তাতে সাড়া দেননি। পরে তাঁর পরিবারের দুর্দশা দেখে নেতৃত্ব অনুমতি দিলে তবেই তিনি সেই পেশায় যান। এতদসত্ত্বেও দলীয় কর্মসূচির দেওয়াল লিখনকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন, একনিষ্ঠ ভাবে সেই কাজে নিবিষ্ট থাকতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের জেলা সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা সহ জেলা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজন এসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড মহাদেব বাউরি লাল সেলাম

ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ করছে বিজেপি

একের পাতার পর

বাদ দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া মানবসভ্যতার ইতিহাস ভাঙাগড়া, উত্থান-পতন, অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণের ইতিহাস। অন্ধকার আছে বলেই মানুষ বাঁচার জন্য আলোর সন্ধান করে, সভ্যতাকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই ইতিহাসের ধারাবাহিক পর্বগুলিকে জানতে হয়। আমাদের দেশের সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা স্রোতের মতো প্রবাহিত। এই ধারায় কখনও ছেদ পড়েনি। প্রাচীন রাজবংশের আমল থেকে শুরু করে সুলতানি যুগের পর মুঘল যুগেও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়নি।

প্রশ্ন উঠেছে, মুঘল পর্বকে সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হল কেন? কেবল মুসলমান বলেই কি বিষয়টিকে সামনে আনা হচ্ছে? তা হলে শের শাহের পাঁচ বছরের শাসনকে কী ভাবে আনা হবে? যে ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তিনি গড়েছিলেন, ঘোড়ার পিঠে করে ডাক-ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন, তা ছাত্ররা কী ভাবে জানবে?

হেমু বিক্রমাদিত্য, রানা প্রতাপ, দুর্গা দেবী, চাঁদ বিবি, শিবাজি প্রমুখ ইতিহাসের নামী অনামী চরিত্রকে সামনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হলে মুঘল সম্রাটদের কীর্তিকাহিনীকেও আনতে হবে। একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনকে প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব? শুধু একজনের কথা বলে গেলে সেটা ইতিহাস না হয়ে গল্পই হবে। ইতিহাসকে মুছে দিয়ে সেই মনগড়া গল্প লেখার ও পড়ানোর জন্যই কি এই উদ্যোগ?

কিন্তু এভাবে কি ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে মুছে দেওয়া যায়? আজও উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা সহ পুরো উত্তর ও পশ্চিম ভারত জুড়ে যে স্থাপত্য-ভাস্কর্যগুলি মুঘল ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, সেগুলি মোছা যাবে কী ভাবে? যে লালকেল্লায় প্রতি বছর স্বাধীনতার বিজয় কেতন উড়ানো হয় তা কার নামাঙ্কিত হবে? তাজমহল, ইবাদতখানা, জামা মসজিদ— এগুলির কী হবে? এটা কেমন করে ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে যে, আকবরের হলদিঘাট আক্রমণের সময়ে মুঘল ফৌজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা মান সিংহ? অন্য দিকে রানা প্রতাপের সেনাপতি ছিলেন হাকিমখান সুর। আবার শিবাজি ও ঔরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে এক দিকে জয়সিংহ ঔরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি, অন্য দিকে শিবাজির সেনাপতি ছিলেন মৌলভি হায়দার আলি কোহরি। দক্ষিণ ভারতে মারাঠারা টিপুর রাজ্য আক্রমণ করে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিল, যা মেরামত করতে জগৎগুরু শঙ্করাচার্যকে টিপু সুলতান সাহায্য করেছিলেন। এই তথ্যভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস এড়িয়ে ছাত্রদের মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে।

একটা সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ইতিহাসবিদেরা ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্নটিকে প্রধান করে তুলে ইতিহাসের যুগবিভাজন করে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ১৮১৮ সালে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জেমস মিল-ই প্রথম ভারতের ইতিহাসকে 'হিন্দু সভ্যতা', 'মুসলমান সভ্যতা' আখ্যা দেন। উল্লেখ্য যে, তিনি কিন্তু 'খ্রিস্টান পর্ব' বলেননি। বলেছিলেন 'ব্রিটিশ পর্ব'। এভাবে তাঁরা সাম্প্রদায়িক ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করেন। ভারতে আসা ব্রিটিশ শাসকরা ব্রিটেনের হেইলবেরি কলেজে এ দেশ সম্পর্কে মিলের ইতিহাস পাঠ নিয়েই আসতেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় ইতিহাসবিদদের একাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন।

উনিশ শতকে ইংরেজ ইতিহাসবিদদের দিয়ে ভারত-ইতিহাস রচনার কাজটি শুরু হয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগ ব্যবহার করেই। এর পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের গভীর ষড়যন্ত্র। যা পরে তাদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তাত্ত্বিক রূপ দিতে কয়েকজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও গবেষক মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে চরম নির্যাতন ও মন্দির ধ্বংসের বিরামহীন অভিযোগ এনে তাদের গ্রন্থে চমকপ্রদ বিবরণ দিতে শুরু করেন। এই কাজে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন তদানীন্তন ভারত সরকারের সচিব এমএইচ এলিয়ট, ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'বিবলিওগ্রাফিকাল ইনডেক্স টু দ্য হিস্টোরিয়ানস অফ মহামেডান ইন্ডিয়া' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে সুলতানি যুগ থেকে শুরু করে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজত্বকালে মুসলমান শাসকদের তীব্র ভাবে নিন্দা করে তাদের অমিতাচার ও লাম্পট্যের কাহিনিকে মুখরোচক ভাষায় তুলে ধরা হয়। সঙ্গে এটাও দেখান যে, তারা কী ভাবে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করত। মন্দির ধবংস করা, ধর্মান্তরিতকরণ, হত্যার কাহিনিকে অনৈতিহাসিক ও বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করা হয়। এলিয়ট আশা করতেন, হিন্দুরা মুসলিম শাসনের সেই অন্ধকার যুগকে (১২০৬-এর সুলতানি যুগ থেকে ১৭০৭-এর ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত) ফিরিয়ে আনার জন্য আর বিলাপ করবে না।

এই ধরনের ব্যাখ্যার আসল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের কাছে কতটা প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য সেটা প্রমাণ করা। যেহেতু এ দেশে মুসলিম শাসকদের অপসারিত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতা দখল করেছিল, তাই তারা স্বাভাবিক ভাবেই নানা কৌশলে মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। তার উপর ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ ও তাতে বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে মুঘল শাসক বাহাদুর শাহকে দেশের সম্রাট হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা দেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আরও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। একদিকে দেশের জনসাধারণের উপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও শোষণের কারণে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে জন্ম নেওয়া ক্ষোভ প্রশমিত করা, অন্য দিকে দেশের সামন্ততান্ত্রিক জমিদার, নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা আটকাতে তাদের মুসলিমবিদ্বেষী প্রচার বিশেষ কৌশল হয়ে উঠেছিল। আবার বিশ শতকের প্রথম পর্বে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ক্ষোভ অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে কোনও ভাবেই মুসলিম জনসাধারণ যাতে অংশ নিতে না পারে তার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি নিয়ে এসেছিল। লর্ড কার্জনের প্রত্যক্ষ মদতে ও আর্থিক সাহায্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম লিগ' গড়ে উঠল। কার্জন ঢাকা সফরে গিয়ে ঢাকার নবাবকে ব্রিটিশদের ক্ষমতায় আসার পূর্বে তাঁরা যে সম্মান পেতেন তা ফিরিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখালেন। দেশে বিভেদ রাজনীতির বিষবৃক্ষ সার-জল পেয়ে ডালপালা মেলল। সৈয়দ আহমেদ খানের মতো প্রগতিশীল সমাজসংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্বও এর প্রভাবে বিপথে চালিত হলেন। অন্য জাতীয় নেতারাও সাম্রাজ্যবাদী এই কৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই কূট কৌশল নেওয়া হলেও শিক্ষিত মুসলিমদের একাংশ সে দিন বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসফাকউল্লাকে বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সরানোর জন্য ব্রিটিশ বহু চেষ্টা করেছিল। আসফাকউল্লা বলেছিলেন, তার নেতা রামপ্রসাদ বিসমিল হিন্দুদের জন্য লড়াই করছেন না— হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন, তাই এই সংগ্রামে আমি জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁর চরিত্রের এই মহত্ব সে দিন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ছাত্র-যুবকদের মধ্যে আলোড়ন ফেলেছিল।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চোখে মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস হল হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের এক দীর্ঘ কাহিনি। তারা দেখাতে চায়, হিন্দু ও মুসলমানরা স্থায়ীভাবে স্বতন্ত্র শিবিরে বিভক্ত ছিল, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তিক্ত, সন্দিগ্ধ এবং বৈরিতাপূর্ণ। সচেতন ভাবেই এই ধরনের চিন্তা আজকে ইতিহাসে আনা হচ্ছে। ১৯২৩ সালে সাভারকার 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে লিখেছিলেন 'যে দিন মহম্মদ গজনি সিন্ধুনদ পার হয়েছিলেন, সে দিন জীবন-মরণের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এবং তা শেষ হয়েছিল বলা যায় কি আবদালীর সঙ্গে?' ওই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, 'দিনের পর দিন, দশকের পর দশক, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই বীভৎস সংঘাত চলতে থাকে, এই সংঘাতে গোষ্ঠী, অঞ্চল ও জাত-পাত নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুরা হিন্দু হিসেবে যন্ত্রণা ভোগ করেন। ... সমস্ত মুসলিমরা ছিলেন শত্রু এবং শত্রুরা আমাদের হিন্দু হিসেবে ঘৃণা করত'। হিন্দু ধর্মের কথা এনে সরাসরি ধর্মীয় আধিপত্যবাদের বিষয়টিকে সামনে আনা হয়েছে। দেশ কেবল হিন্দু ধর্মের, অন্য কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চর্চার সংস্কৃতি এখানে কখনও ছিল না, যদিও বা কিছু থেকে থাকে তা তস্করের সংস্কৃতি, অন্য কিছু নয়।

ভারত ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে মূলত হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা হিসেবে দেখানো হয়। অথচ ইতিহাসে এটা বার বার দেখা গিয়েছে— ধর্মমত যাই হোক না কেন বেশিরভাগ শাসকই ধর্ম নির্বিশেষে অধীনস্থ প্রজাদের উপরে নির্যাতন চালাতেন। অত্যাচার, লুণ্ঠন ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগবাটোয়ারাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব সর্বদাই চলেছে। এই আক্রমণ ও লুণ্ঠনের সঠিক কারণগুলিকে প্রায়শই এড়িয়ে যাওয়া হয়। কেন মন্দির বেশি আক্রান্ত হয়েছে মসজিদ নয়, তার বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। মুসলিমদের দ্বারা যেমন মন্দির ধ্বংস হয়েছে তেমনই কাশ্মীরে, দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজাদের হাতে মন্দির ধ্বংস হওয়ার উদাহরণও খুব কম নয়।

যদি রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বাদও দেওয়া হয়, তবুও সংস্কৃতির বিকাশে মুঘল যুগ ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। মুঘল যুগে চিত্রশিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি, আবুল ফজলের 'আকবরনামা' ও আইন-ই-আকবরি, বাবরের 'তুজুক-ই-বাবরি, গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা', সুরদাস, তুকারাম, তুলসীদাস প্রমুখের গ্রন্থ এর প্রমাণ দেয়। ওয়াকিয়াৎ-ই-বাবুরিতে উল্লিখিত বাইশ জন শিল্পীর মধ্যে মাত্র তিন জন ছিলেন মুসলমান। আবুল ফজল যে সতেরো জন শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছিলেন, তার মধ্যে চার জন মাত্র মুসলমান ছিলেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা জানি, সেতার যন্ত্রটি হিন্দু ও মুসলমানদের দুই ধরনের যন্ত্রের সমন্বয়। এসরাজ, সুরবাহার, সারেঙ্গি হিন্দু-মুসলমানের সাধনার ফসল। ভারতীয় রাগ হিন্দোল ও পারসিক রাগ মোকাম মিলিয়ে ইমন রাগের সৃষ্টি। খসরু থেকে তানসেন মুসলিম সঙ্গীত শিক্ষকদের নাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি-র ব্যবহারে ভারতীয় সঙ্গীতের সমৃদ্ধিতে মুসলিমদের অবদানকে অস্বীকার করলে তা হবে সচেতন ভাবে ইতিহাসের বিকৃতি। হিন্দু-মুসলিম সংযোগের মধ্য দিয়েই উর্দু ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশ মুঘল যুগেই হয়েছিল। মুঘল পূর্ববর্তী যুগের ভারতীয় সভ্যতা প্রায় এক শতাব্দী বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ যুগেই সেই সংযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সূচনা এ যুগেই গড়ে উঠেছিল। এই যুগ আরও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণেই যে, ১৫২৬ থেকে শুরু করে ১৭০৭-এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত দেশে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেনি। মুঘলদের এড়িয়ে যে, চৌহান, পরিহার, শোলাঙ্কি প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে, আজও তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু দাসবংশ, খলজিবংশ, তুঘলকবংশ, লোদিবংশ এমনকি মুঘলরাও আজ ভারতীয় জীবনের মূল ধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বহুত্ববাদ ও সমন্বয়ের বৈচিত্র্যের সাধনা মুঘল যুগেই ঘটেছিল— আজ যা রাষ্ট্র পরিচালকরা অস্বীকার করে বিকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, ইতিহাস হল একটি জাতির স্মৃতি। সেই স্মৃতি যদি লোপ পায় তবে সেই জাতি বিকারগ্রস্ত ও উন্মাদ হয়ে উঠবে। আজ যাঁরা মুঘল যুগকে ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলছেন, তাঁরা নিজেদের জাতিকেও সেই বিপদের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। যদিও আশার কথা, দেশের বরেণ্য ইতিহাসবিদরা ইতিমধ্যে এর প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। অধ্যাপক ইরফান হাবিব সহ প্রথম শ্রেণির আড়াইশো জন ইতিহাসবিদদের প্রতিবাদের খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিতও হয়েছে। বিকৃত ইতিহাস চর্চার বিরুদ্ধে দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন নাগরিকদেরও সচেতন এবং ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

ভুল সংশোধন ঃ গত সংখ্যায় 'পাঞ্জাবের শিক্ষা কনভেনশনে বিপুল সাড়া' সংবাদটির শেষে সভাপতি শ্যামসুন্দর দীপ্তির বক্তব্য বলে যা প্রকাশিত হয়েছে তা কনভেনশনের সভাপতি সৌরভ ঘোষের বক্তব্য। শ্যামসুন্দর দীপ্তি ছিলেন উদ্বোধক। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

জন্মশতবর্ষে

কমরেড শিবদাস ঘোষের বই পড়ুন

● বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময় ● সোশ্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত করেই বিপ্লবী দলকে এগোতে হয় ● শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য ● কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই(সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল ● মার্ক্সবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে

ডিএ ঃ হাইকোর্টের রায় মেনে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করুক

আন্দোলনরত কর্মচারীদের বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, হাইকোর্টের রায় মেনে নিয়ে রাজ্য সরকার কালবিলম্ব না করে আগামীকালই আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনার জন্য বৈঠকে বসুন। আমরা আশা করি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে মর্যাদা দিয়ে বকেয়া ডি এ দেওয়া, শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ ও অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করার দাবি মেনে নিয়ে রাজ্য সরকার দ্রুত তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করবেন।

রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের অবস্থান

৫ এপ্রিল বিভিন্ন দাবিতে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ রাজ্যব্যাপী অবস্থান-বিক্ষোভ-ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে। এ দিন কলকাতায় হগ মার্কেট চ্যানেলে ১৫ দফা দাবিতে অবস্থান ও বিক্ষোভ সভা চলে (ছবি)।

বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের বিরুদ্ধে এবং সরকারি শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ, দুর্নীতিগ্রস্তদের কঠোর শাস্তি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ, নারী নির্যাতন বন্ধ, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, প্যান ও আধার কার্ড সংযুক্তির জন্য জরিমানা নেওয়া বন্ধ, সংযুক্তির সময় এক বছর বাড়ানো ও ইতিমধ্যে তোলা জরিমানা ফেরত দেওয়া এবং পশ্চিমবাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিতকারীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে রাজ্যপাল মঞ্চের আহ্বায়ক পূর্বতন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, অশোক দাস, শান্তি ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, অধ্যাপক তরুণ দাস প্রমুখ এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। ব্যারাকপুর, তমলুক, মেদিনীপুর শহর, বেলদা, কোচবিহার সহ বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি পালিত হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক হাসপাতাল মোড়-মানিকতলা-দেউলিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাইওভার ও পাঁশকুড়া রেলস্টেশনে ওভারব্রিজ নির্মাণ প্রভৃতি দাবিতে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে মানিকতলা মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন অবস্থান মঞ্চের সভাপতি সুশীল দাস, জ্ঞানানন্দ রায়, নরেন্দ্রনাথ

এবং মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সভাস্থলে আধার-প্যান সংযুক্তির জন্য এক হাজার টাকা জরিমানা নির্দেশের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। মাইতি, সুমিত রাউত, অসীমা পাহাড়ী, শঙ্কর মালাকার, লক্ষ্মীকান্ত সাঁতরা, স্বপন কুমার ভৌমিক, দীপক ওঝা, তপন নায়ক প্রমুখ।

প্রগতিশীল সাহিত্য বাতিলের প্রতিবাদ এআইডিওয়াইও-র

উত্তরপ্রদেশের স্কুল-সিলেবাস থেকে মহাকবি নিরালা সহ প্রগতিশীল কবিদের কবিতা বাদ দিয়ে দিচ্ছে এনসিইআরটি এবং রাজ্যের বিজেপি সরকার। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এআইডিওয়াইও-র সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কুমার ৫ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, কবি নিরালা 'তোড়তি পাথর ম্যায়নে দেখা উসে ইলাহাবাদকে পথ পর', 'রাম কি শক্তি পূজা'-র মতো প্রখ্যাত কবিতার রচয়িতা। একইভাবে ফিরাক গোরখপুরি তাঁর বিপ্লবাত্মক গজলের মধ্য দিয়ে মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন। এই সমস্ত কবি-সাহিত্যিকদের রচনা পুনরায় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে এআইডিওয়াইও।

এগরায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি এগরা মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে ৫ এপ্রিল বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিদ্যুতের জন্য বাঁশের খুঁটি পরিবর্তন করে কংক্রিট খুঁটি লাগানো, খারাপ মিটার দ্রুত পরিবর্তন, স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানোর চক্রান্ত বন্ধ, কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে ২০১৩-২০১৪ সালে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা অবিলম্বে ফেরত প্রভৃতি দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদক প্রদীপ দাস।

ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন মহকুমা কমিটির সম্পাদক সনাতন গিরি, সুবল খাড়া, অরুণ বর প্রমুখ। ডিভিশনাল ম্যানেজার স্থানীয় সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

পুলিশি হয়রানি বন্ধ, সরকারি লাইসেন্স দেওয়া সহ সাত দফা দাবিতে ৬ এপ্রিল আসানসোলে ডেপুটি কমিশনারের দপ্তরে মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

স্বীকৃতির দাবিতে টোটো চালকদের মিছিল

৪ এপ্রিল সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের ডাকে সকল ই-রিক্সা বা টোটোর সরকারি রেজিস্ট্রেশন, চালকদের পরিবহণ কর্মীর স্বীকৃতি, সামাজিক সুরক্ষা সহ ৬ দফা দাবিতে, বিক্ষোভ মিছিল করে পরিবহণ মন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেন টোটো চালক। এ দিন চার শতাধিক টোটো চালকরা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে সুসজ্জিত মিছিল করে ওয়াই চ্যানেলে বিক্ষোভ সভায় যোগ দেন। অংশুধর মণ্ডলের নেতৃত্বে তিন জনের প্রতিনিধি দল শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে এবং রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রামের নেতৃত্বে তিন জনের প্রতিনিধি দল পরিবহণ দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করে। ওয়াই চ্যানেলে বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি হারাধন দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন

এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। পরিবহণ মন্ত্রী জানান রেজিস্ট্রেশন না থাকলেও কোনও টোটোকে বন্ধ করা হবে না। সকল টোটো চালকদের পরিবহণ শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া হবে।

ঝাড়গ্রাম জেলা যুব সম্মেলন

এআইডিওয়াইও-র ডাকে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রথম যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৬ মার্চ আইএমএ হলে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জি। সম্মেলন থেকে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড রাজকুমার মাহাতো এবং কমরেড তপন শীট, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন কমরেড জগদীশ চালক।

জোতদার পরিবারের সন্তান থেকে শোষিত মানুষের নেতায় উন্নীত হয়েছিলেন কমরেড প্রবোধ পুরকাইত

এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চাষি-মজুর, মেহনতি মানুষের নেতা, কুলতলি কেন্দ্রের ন'বারের বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটল ২৬ মার্চ ভোরে। ওই দিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জয়নগরের দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। এই জননেতার প্রয়াণের সংবাদ পেয়েই জেলার সব প্রান্ত থেকে দলের কর্মী ও হাজার হাজার সাধারণ মানুষ তাঁকে শেষবার দেখার জন্য ছুটে আসেন।

বিগত শতকের ৬০-এর দশকের শেষ ভাগ থেকে চাষি-মজুরের ওপরে নির্মম শোষণ-বঞ্চনা, জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) -র নেতৃত্বে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় যে উত্তাল লড়াই শুরু হয়েছিল, সেই আন্দোলনে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত বিশেষ স্থান অর্জন করেন।

চুপড়িঝাড়া এলাকার অত্যন্ত প্রতাপশালী জোতদার পরিবারের সন্তান কমরেড প্রবোধ পুরকাইত কলেজে পড়ার সময় দলের কথা শুনেছিলেন। ছাত্র জীবনের শেষে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে গরিব চাষি-মজুরের পক্ষ নিয়ে জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং নিজেকে দলের সাথে যুক্ত করেন। ছাত্রজীবনে প্রথমে ডায়মন্ডহারবার কলেজে ও পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজে পড়াশোনা শেষ করে কুলতলির ভুবনেশ্বরী জয়কৃষ্ণ হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে গ্রামে ফিরে দলের সংগঠক কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর জীবনসংগ্রাম দেখে ও তাঁর প্রচেষ্টায় তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। দলের তৎকালীন জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সাহচর্যে দলের কর্মীতে পরিণত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জীর মতো সুযোগ্য নেতৃত্বের সংস্পর্শে জীবন সংগ্রামকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করেন। দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৬৭ সালে দল তাঁকে বিধানসভার প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করে। তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হন। কেবলমাত্র ১৯৭২ সালে যখন কংগ্রেস সারা রাজ্যে ভোটে ব্যাপক রিগিং ও সন্ত্রাস করেছিল সেবার ছাড়া জনগণ তাঁকে ৯ বার বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত করেন।

তাঁর কাকা ছিলেন কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা। তিনি বহু চেষ্টা করেও বিপ্লবী আন্দোলন থেকে কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে নিবৃত্ত করতে পারেননি। তিনি পরিবারের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছেন। তেভাগার দাবিতে, জোতদারদের দ্বারা চাষিদের শোষণের উদ্দেশ্যে চালু করা নানাবিধ কুপ্রথা প্রতিরোধে গড়ে ওঠা দুর্বার আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। হাজার হাজার বিঘা বেনাম জমি উদ্ধার করে চাষিদের হাতে তুলে দেওয়ার সফল সংগ্রামে তাঁর সাহসী ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে জোতদার ও কায়েমি স্বার্থবাজদের ষড়যন্ত্রে পুলিশ তাঁকে প্রচণ্ড মারধোর এবং গ্রেপ্তার করে নদীপথে থানায় আনতে গেলে চাষিরা আশঙ্কা করেন লোকচক্ষুর অন্তরালে পুলিশ তাঁকে খুন করে ফেলতে পারে। চাষিরা নদীঘাটে থাকা নৌকাগুলি কুড়ুল মেরে অচল করে দিলে পুলিশ তাঁকে 'মাচায়' করে মাথায় তুলে নিয়ে হাঁটা পথে মানুষের চোখের সামনে দিয়ে থানায় নিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

৮০-র দশকে মৈপীঠে সিপিএম নেতৃত্ব এস ইউ সি আই (সি)-র সংগঠনকে ভাঙতে বর্বর ভূমিকা নেয়। দলের কর্মীদের নৃশংস হত্যা, লাশ গায়েব করা, পুলিশকে পাশে নিয়ে ব্যাপক সন্ত্রাস, মহিলাদের উপর অকথ্য অত্যাচার, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, গ্রাম থেকে তাড়ানো প্রভৃতি সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকে। সেই সময়ে শতাধিক পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর যৌথ অভিযানের সামনে পুরুষ কর্মী-সমর্থক শূন্য গ্রামে মাত্র একজনকে নিয়ে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানান। এই ধরনের বহু ঘটনায় মৃত্যুর পরোয়া না করে শাসক শ্রেণির আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। জোতদার পরিবারের সন্তান হলেও তিনি আদর্শবান নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গরিব মানুষের মধ্যেই জীবনের বড় সময় কাটিয়েছেন। তাদের পর্ণকুটিরে থাকা ও মেলামেশায় নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলেন। জনগণের মধ্যে দলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুর্গম কুলতলির গ্রামে গ্রামে দিনে ৫০-৬০ মাইল হেঁটে ঘুরতেন। সহজ-সরল ভাষায় আকর্ষণীয় ভাবে তিনি বক্তব্য তুলে ধরে জনগণকে উদ্দীপ্ত করতে পারতেন। গরিব মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলনের পর আন্দোলনে তিনি যে নিবেদিতপ্রাণ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন তার ফলে জনগণ তাঁকে নিজেদেরই আপনজন হিসাবে সাদরে গ্রহণ করে নেয়। সাধারণ মানুষ তাদের পারিবারিক সামাজিক নানা সমস্যা নিয়ে প্রায় সর্বদাই তাঁকে ঘিরে রাখত। দায়বদ্ধতা ও মমতার সাথে তাদের সাহায্যে তিনিও সদাব্যাপৃত থাকতেন।

বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

জনপ্রিয় হলেও দলের শিক্ষায় তাঁর মধ্যে অহঙ্কারবোধ জায়গা করতে পারেনি। একদিকে বিধানসভায় দলনেতা হিসাবে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে, অপর দিকে দলের নেতা হিসাবে কমরেড ইয়াকুব পৈলান বা আমির আলি হালদারকে অন্তর থেকে মেনে নিয়ে সাবলীলভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। বয়সে ছোটদের নেতৃত্ব মেনে নিতেও তাঁর অসুবিধা হয়নি। তিনি সমালোচনাকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারতেন, ক্ষুব্ধ হতেন না।

পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিভূ কংগ্রেস এলাকায় ক্রমাগত হীনবল হয়ে পড়লে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। জোতদার কায়েমি স্বার্থবাদীরা সিপিএমের সাথে অশুভ আঁতাত গড়ে তোলে এবং রাতারাতি সিপিএম হয়ে যায়। আদর্শগত ও সাংগঠনিক দিক থেকে এস ইউ সি আই (সি)-কে দুর্বল করতে না পেরে এই জেলায় দলের কর্মী-নেতাদের খুন-সন্ত্রাস-মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা জনপ্রিয় নেতা প্রবোধবাবুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ১৯৮৫ সালে খুনের মিথ্যা মামলায় তাঁকে জড়িয়ে দেয়। নিম্ন আদালতে কয়েকজন কর্মীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। প্রবোধবাবু সহ শতাধিক কর্মী মুক্তি পান। বিস্ময়করভাবে পরবর্তীকালে প্রবোধবাবু সহ দলের ৫ জন নেতার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আকস্মিকভাবে মামলা ওঠে ও তাঁর যাবজ্জীবন জেলের আদেশ হয়। ২০০৫-এর ১৯ আগস্ট হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে তাঁকে জেলে পৌঁছে দেয়। জেলযাত্রার সূচনায় তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর হাতে রক্তপতাকা তুলে দিলে সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেহ থাকবে কারাগারে, মন পড়ে থাকবে কুলতলির ঘরে ঘরে'। ২০১৫-র ২০ আগস্ট দল তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। জেলের মধ্যে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে ও নানা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ বছর প্রায় শয্যাশায়ী থাকেন। দীর্ঘ কারাবাসের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে জেলের মধ্যে পার্টির প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় কর্মসূচি, যেমন ২৪ এপ্রিল দলের প্রতিষ্ঠা দিবস, ৫ আগস্ট মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রয়াণ দিবস, নভেম্বর বিপ্লব দিবস প্রভৃতি পালিত হত। সেই কর্মসূচিগুলিতে অন্য বন্দিরাও যোগ দিতেন। এর মাধ্যমে বহু বন্দি, এমনকি জেলের অফিসারদের মধ্যে তাঁরা দলের রাজনীতির প্রভাব

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রখর রোদেও স্মরণসভায় মানুষের ঢল

কুলতলিতে স্মরণসভা

৫ এপ্রিল কুলতলির জামতলা বাজারে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত স্মরণসভায় পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু বলেন, কমরেড প্রবোধ পুরকাইত যে ভাবে হাজার হাজার গরিব, মেহনতি মানুষের পরিবারের একজন হয়ে তাঁদের সমস্যা নিয়ে লড়াই করেছেন, তা অবিস্মরণীয়। এই গুণ জন্মগত ছিল না, তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে। দলের চিন্তার আলোকে তিনি সমাজে শোষণের চরিত্রকে চিনেছেন। বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি— নিজের জীবনে তা প্রমাণ করে গেছেন কমরেড প্রবোধ পুরকাইত। তিনি বলেন, এস ইউ সি আই (সি)-র আদর্শের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রবোধ পুরকাইতের মতো এগিয়ে আসুন, নির্বাচনেও সেইভাবে লড়ুন। আরেক জন প্রবোধ পুরকাইত হওয়ার চেষ্টা করুন।

রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, এলাকার মানুষের তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ যা তাঁর মৃত্যুর পরেও দেখা গেল তা ব্যক্তি প্রবোধ পুরকাইতের প্রতি নয়, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে পাথেয় করে যে নতুন জীবনবোধ তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তার প্রতি।

বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক তরুণকান্তিনস্কর ও জয়কৃষ্ণ হালদার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সৌরভ মুখার্জী। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু। সভায় ৫ হাজারের বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের মতামত

ওষুধের দাম আকাশছোঁয়া

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এক ধাক্কায় ন'শোরও বেশি ওষুধ ও ইঞ্জেকশনের দাম ১০ থেকে ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দিল। ভারতে ওষুধের সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণকারী সংস্থা ন্যাশনাল ফার্মাসিটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটির তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে। যেসব ওষুধের দাম বাড়ছে তার মধ্যে রয়েছে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট, বিভিন্ন ধরনের সিরাপ, সংক্রমণ প্রতিরোধক ড্রাগ ও ইনজেকশন। টিটেনাস ইনজেকশন, মধুমেহ রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইনসুলিন, ডিটিপি ভ্যাকসিন, ফ্লোরিক অ্যাসিড যুক্ত ওষুধ সহ আরও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ওষুধ। ওষুধের এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে গভীর বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে। একচেটিয়া ওষুধ কোম্পানিগুলিকে অত্যধিক মুনাফা পাইয়ে দিতেই ওষুধের এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে মোদি সরকার। জনগণের জন্য রইল শুধু আচ্ছে দিনের বটিকা।

রঞ্জিত কুমার রায়
মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার

জয়নগরে মিড ডে মিল কর্মীদের বিডিও ডেপুটেশন

৫ ও ৬ এপ্রিল যথাক্রমে জয়নগর ২ ও ১ নম্বর ব্লক অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের মিড ডে মিল কর্মীরা তাঁদের নানা দাবি নিয়ে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় তিন শতাধিক মহিলা বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

তাঁদের দাবি— বছরে ১০ মাস নয়, ১২ মাসের বেতন দিতে হবে। বেতন বৃদ্ধি করে অন্তত মাসে ৬,৩০০ টাকা করতে হবে, মিড ডে মিল কর্মীদের নির্দিষ্ট কাজের বাইরে বাড়তি কাজ করানো চলবে না, অবসরকালীন ভাতা দিতে হবে, মিড ডে মিল কর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। এই দাবিগুলির ভিত্তিতে এক প্রতিনিধিদল বিডিও-কে স্মারকলিপি দেন। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে সেগুলি পূরণে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

কমরেড প্রবোধ পুরকাইত স্মরণে

পাঁচের পাতার পর

ফেলেছিলেন। নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট মনীষী ও বিপ্লবী, শহিদদের জীবনচর্চা করতেন জেলবন্দিদের নিয়ে।

কমরেড প্রবোধ পুরকাইত দলের সংবাদ জানতে ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। তত্ত্ব চর্চার আগ্রহে বহু পত্র-পত্রিকা পড়তেন। দেখা হলেই কর্মীদের উৎসাহিত করতেন। বিশিষ্ট নেতাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে হাজির হতেন। গত ১১ মার্চ, জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ শুনতে অসুস্থ শরীরেই এসেছিলেন। এটাই ছিল রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাঁর শেষ অংশগ্রহণ।

তিনি বিধায়ক থাকা অবস্থায় তৎকালীন সিপিএম পরিচালিত সরকার দেশি-বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে ইকোটুরিজমের নামে সুন্দরবনের জল জঙ্গল, জীবন জীবিকা ও পরিবেশ বিনষ্টকারী প্রকল্প রূপায়ণে মেতে ওঠে। দলের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধেআন্দোলন গড়ে তুলে তা প্রতিহত করা হয়। সেই আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুন্দরবনে সর্বনাশা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার বিরুদ্ধে আন্দোলনেও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কর্মময় জীবনে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের সকল জনবিরোধী নীতি ও ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে রাজ্যে গড়ে ওঠা প্রতিটি আন্দোলন ও দলের কর্মসূচি রূপায়ণে তিনি আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। কুলতলি এলাকার পানীয় জল, রাস্তাঘাট, স্কুল, স্থল ও নদীপথে যানবাহন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নে তাঁর প্রচেষ্টা এলাকার মানুষের কাছে সমাদৃত হয়। খরা, বন্যা, ঝড় ঝঞ্ঝার বিভিন্ন বিপর্যয়ের মুহূর্তে দুর্গতদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ ও বণ্টনে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ঘটিহারানিয়ায় হাইস্কুলে প্রায় ৩০ বছর তিনি ছিলেন পরিচালন সমিতির অন্যতম কাণ্ডারি। বর্তমানে সেখানে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে দলমত নির্বিশেষে মানুষকে নিয়ে কমিটি গড়ে তুলে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। গরিব মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরাতে সম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধানোর ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে তিনি সদাজাগ্রত ভূমিকা রেখে গেছেন। কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের প্রয়াণে দল হারিয়েছে এক বলিষ্ঠ নেতাকে, জনসাধারণ হারিয়েছে তাঁদের অত্যন্ত আপনজনকে।

কমরেড প্রবোধ পুরকাইত লাল সেলাম

বৈভবের 'স্বর্গরাজ্য' আমেরিকায়

যুবসমাজ ভুগছে ভয়ঙ্কর অবসাদে

মানসিক অবসাদ, অবসাদজনিত আত্মহত্যা, একাকীত্ব আজকের সমাজে নতুন নয়। সংবাদপত্র, সোশ্যাল মিডিয়া, টিভির খবরে চোখ রাখলেই দেখা যায়, মানসিক অবসাদের প্রকোপ সর্বত্র ক্রমাগত বাড়ছে। বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এর বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ার মতো। একচেটিয়া পুঁজিশাসিত সমাজ মুষ্টিমেয় পুঁজিমালিকের বিপুল মুনাফার বিনিময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে শুধু আর্থিক ভাবেই নিঃস্ব করেনি, কেড়ে নিচ্ছে মনের স্বাভাবিক সুস্থতা, আনন্দ, প্রশান্তিও। পুঁজির স্বর্গরাজ্য আমেরিকার বুকে একটি সংস্থার সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্টে নতুন করে উঠে এসেছে মানসিক স্বাস্থ্যের এই উদ্বেগজনক ছবি।

'আমেরিকা' বললে এই সেদিনও মূলধারার মিডিয়ার দৌলতে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের সাধারণ মানুষের চোখে এক ঝাঁ-চকচকে সুখী সমৃদ্ধ দেশের ছবি ভেসে উঠত। বিশ্বায়নের কল্যাণে হাজারো আমেরিকান ব্র্যান্ড ঢুকে পড়েছিল ভারতবর্ষের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে। সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর রমরমাকে কেন্দ্র করে কিছুদিনের জন্য এ দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছাত্রদের ঢল নেমেছিল আমেরিকার কর্মক্ষেত্রে, যার পোশাকি নাম হয়েছিল 'ব্রেন ড্রেন'। আজ সময় আরও এগিয়েছে। আরও তীব্র হচ্ছে পুঁজিবাদের শোষণ। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মুখোশ খুলে ক্রমশ বেরিয়ে পড়ছে শাসকের নখ-দাঁত। ইন্টারনেটের কল্যাণে আমেরিকা সহ প্রথম বিশ্বের দেশগুলোর দারিদ্র, কর্মহীনতা, শ্রমিক বিক্ষোভের পরিসংখ্যান পাওয়া আজ কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। আমেরিকার বুকে 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন, জর্জ ফ্লয়েড হত্যা এবং তার পরবর্তী গণবিক্ষোভের মতো অজস্র ঘটনা প্রমাণ করেছে— দারিদ্র, বৈষম্য, জাতিভেদ, আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের উদাসীনতা এবং অপদার্থতাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমেরিকার মানুষের মধ্যেও প্রতিনিয়ত জমা হচ্ছে ক্ষোভের পাহাড়। ছাত্র-যুবদের মানসিক স্বাস্থ্যের এই সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, ভৌগোলিক বা আর্থ-সামাজিক ব্যবধান যাই থাক, দেশে দেশে তরুণ প্রজন্মের অবসাদগ্রস্ততার ছবিটা কমবেশি একই রকম।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা সেন্টার ফর ডিসিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে মাস দুই আগে। আমেরিকায় যুবসমাজ তথা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মানসিক অবসাদ কী ব্যাপক হারে বাড়ছে, তার ভয়াবহ ছবি উঠে এসেছে ওই সমীক্ষায়। ২০২১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বেসরকারি এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি হয়, তার মধ্যে ৭০ লক্ষেরও বেশি তীব্র হতাশা ও অবসাদের কবলে পড়ে। মানসিক চাপ ও বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্য আত্মহত্যা করে প্রায় ১৭ লক্ষ জন। তথ্য বলছে, দেশের বুকে ১৫ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর প্রধান কারণই হল অবসাদজনিত আত্মহত্যা।

সিডিসি এর কারণ হিসেবে দু'বছর ধরে চলা করোনা অতিমারিকে চিহ্নিত করেছে, যার ফলে সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য ক্রমাগত ভেঙে পড়েছে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে চরম দারিদ্র, সামাজিক অসাম্য, পুলিশি অত্যাচার ও যুদ্ধ। ইম্পেরিয়াল কলেজ-লন্ডন-এর তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় প্রায় আড়াই লক্ষ তরুণ করোনা অতিমারির সময় রুজিরুটি হারিয়েছিলেন। কোভিডের আক্রমণে মা-বাবার মৃত্যুর পর মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও অনেকে। ২০২০ সালে এই সংস্থাই আমেরিকায় অভিভাবকদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছিল, অতিমারিজনিত আর্থিক বিপর্যয়, প্রিয়জনের মৃত্যু কী ভাবে আমেরিকার মানুষকে দিশাহীন অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। আমেরিকায় ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির চাইল্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি বিভাগের অধ্যাপক লাকি (ক্যাথলিন) ম্যাকগর্ন বলেন, বহু অভিভাবক কোভিডের সময় মানসিক উত্তেজনায় বিধ্বস্ত হয়েছেন, অনেকেই ভুগেছেন মানসিক অবসাদে। অভিভাবকদের মানসিক অস্থিরতা, অবসাদ স্বভাবতই সন্তানদেরও প্রভাবিত করেছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক হয় যে, 'আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিকস' শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। স্বভাবতই, দেশের নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের এই শোচনীয় অবস্থায়, সরকারের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। গোটা বিশ্বের মধ্যে কোভিডে মৃত্যুতে আমেরিকা ছিল একেবারে সামনের দিকে। সেখানে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল দশা, সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে থাকা বিপুল ব্যয়বহুল চিকিৎসা-ব্যবস্থার ছবি বিভিন্ন মাধ্যমে উঠে আসে। এই সমীক্ষা এটাও প্রমাণ করল, স্বজনহারা মানুষগুলোর দেখভালের জন্য, ছাত্র-যুবকদের মানসিক সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ সরকার নেয়নি। সমীক্ষা বলছে, আমেরিকায় নারীসমাজের অবস্থাও উদ্বেগজনক। ৫৭ শতাংশ ছাত্রী চরম হতাশার মধ্যে দিয়ে গেছে, ৪১ শতাংশ জানিয়েছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির কথা। তার আগের পুরো বছর জুড়ে ৩০ শতাংশ ছাত্রী আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার কথা ভেবেছে। এদের বড় অংশই আত্মহত্যা করেছে অথবা তার চেষ্টা করতে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছে। বোঝাই যায়, এই পরিস্থিতি একদিনে তৈরি হয়নি। করোনাজনিত মানসিক স্বাস্থ্যহানি এর একমাত্র কারণও নয়। আর্থিক অসাম্য, পুলিশি অত্যাচার, যুদ্ধ, নিরাপত্তার অভাব বছরের পর বছর দেশের মানুষকে এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করেছে, যার ফলাফল উঠে এসেছে এই রিপোর্টে।

বছর বছর এই ধরনের সমীক্ষা হয়, ফল বেরোয়। দেখা যায়, আমেরিকা, ইউরোপ থেকে শুরু করে সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশে মানসিক স্বাস্থ্যের গ্রাফ ক্রমশই নিম্নগামী। ভারতেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠরত মেধাবী ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আর্থিক দুর্দশা দিয়েও সবটা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, কারণ এই অবসাদ-আত্মহত্যা উচ্চবিত্তদের মধ্যেও যথেষ্ট বেশি। তা হলে এর উৎস কী, শেষই বা কোথায়? চিকিৎসা বা কাউন্সেলিং দিয়েও বাঁধভাঙা বন্যার মতো এই অবসাদ তেমনভাবে আটকানো যাচ্ছে না কেন? এই সর্বনাশ আটকানোর পথ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায়।

সাতের পাতায় দেখুন

কঙ্কনদিঘিতে দলের অফিস উদ্বোধন

৩ এপ্রিল ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার কঙ্কনদিঘিতে এসইউসিআই(সি)-র আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড মাদার নস্কর। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নেতা কমরেড সামাদ আলি খাঁ।

নদীবেষ্টিত সুন্দরবনের এই দ্বীপভূমিতে পঞ্চাশের দশকে জোতদার জমিদারদের দ্বারা উচ্ছেদের হাত থেকে চাষিদের রক্ষা করা, জমিদারদের কবল থেকে বেনাম জমি উদ্ধার করে গরিব চাষি ও ভূমিহীন খেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন, ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ চাষিকে দেওয়া, খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি— এই সমস্ত দাবি নিয়ে এ যুগের অগ্রগণ্য মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক চাষি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। জটা কঙ্কনদিঘী এলাকায় সেই আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। সংঘটিত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক চাষি আন্দোলন। জোতদার শাসক দল ও পুলিশের অত্যাচারে, লাঠি ও গুলিতে নোনা মাটি সেদিন রক্তাক্ত হয়েছিল। প্রতিরোধ আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি) দলের ৯ জন সংগ্রামী কমরেড শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন অসংখ্য। তাঁরা জীবন আহুতির মধ্য দিয়ে দলের সংগ্রামী বামপন্থা ও গণআন্দোলনের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন রেখে গেছেন। বর্তমান সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর জনবিরোধী নীতি ও সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধানের দাবিতে এই এলাকার সাধারণ মানুষ দলের নেতৃত্বে আজও ধারাবাহিক আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছেন। এই আন্দোলনের প্রয়োজনেই দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন। এলাকার জনসাধারণের সাহায্য, ঐকান্তিক সহযোগিতা ও উৎসাহে সম্পন্ন হয়েছে অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে দলীয় কার্যালয় নির্মাণের কাজ। প্রধান বক্তা কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান সমাজ পুঁজির শাসন শোষণে বিপর্যস্ত। দেশের সকল সম্পদ মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের হাতে কুক্ষিগত। এদের সেবাদাস শাসক দলগুলি এই শোষণকে টিকিয়ে রাখতে মানুষকে বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে আন্দোলনমুখী হতে না দিয়ে ভোটের মোহে আটকে রাখতে চায়। এই মোহ থেকে শোষিত মানুষকে সংগঠিত করে বিপ্লবের আঘাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েম করতে হবে। তা না হলে শোষণ অত্যাচার থেকে মুক্তির রাস্তা নেই।

‘হনুমানভক্ত’দের কোপে মুর্শিদাবাদের সাংবাদিক

মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক, ‘ঝড়’ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চন্দ্রপ্রকাশ সরকার ৬ এপ্রিল কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুসরণে একটি রচনা পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। বহরমপুর থানার পুলিশ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বলে, এই লেখাটিতে অনেকে রুষ্ট হয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন, তাই পোস্টটি ডিলিট করতে হবে। চন্দ্রপ্রকাশ সরকার পোস্টটি ডিলিট করেন, তাঁর অনিচ্ছায় অন্যের বিশ্বাস আহত হলে তিনি দুঃখিত বলে একটি লেখাও দেন।

এরপরই একদল উগ্র জনতা থানায় ঢুকে আস্ফালন করতে থাকে। পুলিশ চন্দ্রপ্রকাশ সরকারকে থানায় বসিয়ে রাখার পর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দেয়। পরদিন তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও অফিস সম্পাদক। উল্লেখ্য, চন্দ্রপ্রকাশ সরকার জেলা সাংবাদিক সংঘের সহসম্পাদক ও প্রাক্তন সভাপতি। উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সহসভাপতি, এপিডিআর-এর জেলা সম্পাদক, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল নিউজ পেপার্স এডিটর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং জেলার দৈনিক ও ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা। জেলার বিশিষ্ট আইনজীবীরা তাঁর পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন। অন্য আইনজীবীরাও আদালতে উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ সওয়ালের পর ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রপ্রকাশ সরকারের জামিন মঞ্জুর করেন।

এ প্রসঙ্গে আইনজীবী পীযূষ ঘোষ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, চন্দ্রপ্রকাশ সরকার কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য কিংবা সমাজে কোনও সমস্যা সৃষ্টির জন্য এ লেখা লেখেননি। তিনি যা লিখেছেন তা বাস্তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি অংশের ভাবার্থ, যে রামায়ণ আদালতে পেশ করা হয়েছে। ‘ঝড়’-এর সম্পাদক কৌশিক চ্যাটার্জী বলেন, ‘দেশে স্বাধীন মত প্রকাশের পরিসর ক্রমশ কমে আসছে, এ রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। এ ঘটনা সেটাই প্রমাণ করল।

দাবি আদায় করলেন উত্তর দিনাজপুরের কৃষকরা

৯ মার্চ এআইকেকেএমএস ইটাহার ব্লক কমিটির নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক কৃষক ইটাহার এডিএ-র কাছে এমআরপি রেটে সার, সারের কালোবাজারি বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন দেয়। এডিএ সমস্ত দাবি মেনে নেন। কৃষকরা সঙ্গে সঙ্গে দোকানে গেলে দোকানদার এমআরপি রেটে সার দিতে বাধ্য হন।

আন্দোলনের এই জয়ে কৃষকরা প্রবল উৎসাহিত হন এবং আগামী দিনে দাবি আদায়ে আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেন। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন হবিবুর রহমান, সফিকুল আলম ও তপন দাস।

পকেট কাটছে মোদি সরকার

দুয়ের পাতার পর

ফলে সেই অ্যাকাউন্টকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আজ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে আধার-প্যান যুক্ত করাতে হচ্ছে তাদের। কোনও একটি সংসারে যদি পাঁচ জন সদস্য থাকে, আর তাদের যদি একটি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টথাকে, তবে সেই সংসারের প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাঁচিয়ে রাখতে গেলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তাদের আধার প্যান যুক্ত করাতে হবে। কোটি কোটি টাকার বিছানায় শুয়ে থাকা নেতা-মন্ত্রীরা একবার ভেবে দেখেছেন এই টাকার কোথা থেকে জোগাড় করবে তারা? নেতা-মন্ত্রীদের মতো তাদের পিছনে তো আদানি-আম্বানি সাহেবদের আশীর্বাদের হাত নেই। তবে কেন বিজেপি সরকার সাধারণ অসহায় মানুষকে এই সংকটের মধ্যে ফেলে দিল? আরও একটি প্রশ্ন এইযে জরিমানার নামে হাজার হাজার কোটি টাকা তোলা হচ্ছে এই টাকার হিসেব কোথায়? কত হাজারকোটি টাকা সরকার এইভাবে তুলছে? কোন খাতে খরচ হবে এই টাকা? এই টাকার ছিটেফোঁটাও কি জনকল্যাণে খরচ হবে? নাকি পি এম কেয়ার ফান্ডের মতোই প্যান-আধার সংযুক্তির নামে জরিমানার হাজার হাজার কোটি টাকাও ভোজবাজিতে মিলিয়ে যাবে?

একদিকে বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোক্সির মতো অসাধু ব্যবসায়ীরা জনগণের টাকা লুটে মোদি সরকারের মদতে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারে, অপরদিকে সরকার নিজের হাতে নানা কায়দায় জনগণকে লুটছে। একচেটিয়া মালিকরা ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দিলে সরকার নিছক দর্শক। আর সেই ক্ষতি পূরণ করতে নানা অছিলায় মানুষের ঘাড়ে জরিমানার এত বড় বোঝা চাপিয়ে দিল মোদি সরকার। এসইউসিআই(সি)-র দাবি জরিমানা বন্ধ করতে হবে ও আদায় করা জরিমানা ফেরত দিতে হবে।

কলকাতা কর্পোরেশনের সামনে বিক্ষোভ। ৫ এপ্রিল

যুবসমাজ ভুগছে অবসাদে

ছয়ের পাতার পর

প্রতিযোগিতা এই পুঁজিবাদী সমাজের মূলগত বৈশিষ্ট্য। স্বভাবতই উপরিকাঠামো তথা সমাজের মানসিক কাঠামোতেও তার প্রতিফলন ঘটে। তাই মানুষও এই সমাজে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই সমাজে প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। যত দিন যাচ্ছে, পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্কট বাড়ছে দ্রুত হারে। একই সাথে বাড়ছে একদিকে সুযোগের অভাব, অন্যদিকে অন্যকে দমিয়ে নিজেকে বড় করে তোলার প্রবণতা। এই সমাজে সকলকে পিছনে ফেলে এগোতে না পারলে মূল্য থাকবে না— এই আশঙ্কা চেপে বসছে বহু মানুষের মনে। তার জন্য সবেতেই প্রথম হওয়ার এত চাপ।

তারই সঙ্গে মানুষকে ঘিরে রয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। অনেক খরচ করে ডিগ্রি তো জোগাড় করা গেল, কিন্তু কাজ মিলবে তো? আজ কাজ আছে, কাল থাকবে তো! কাজের জায়গায় চূড়ান্ত পারদর্শিতা যদি দেখানো না যায়, প্রোমোশন যদি আটকে যায়, জীবনটাই তো তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে! এই ধরনের দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ-অনিশ্চয়তা কুরে কুরে খাচ্ছে মানুষকে। অনিশ্চয়তা বাসা বেঁধেছে পারিবারিক সম্পর্কগুলির মধ্যেও। চরম আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙেচুরে দিচ্ছে, বিকৃত করে দিচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকেও। এই পরিস্থিতি জন্ম দিচ্ছে হতাশা, অবসাদের।

আরও একটি বিষয় আছে। পরিবারগুলো কিছুদিন আগেও যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছোটদের দিত, আজ তা দিতে পারছে না। প্রবল আর্থিক সঙ্কট স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পরিবারের সকলকে কাজে নামতে বাধ্য করছে। ফলে ছোটদের দেখার সময় আজ অনেকেরই হাতে নেই। আবার দেখা যাচ্ছে পরিবার যত উচ্চবিত্ত, বিচ্ছিন্নতা তত যেন বেশি। কারণ, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র। দরিদ্র মানুষের কুটিরে আজও যে মানবিকতা, স্নেহ ছোটদের ঘিরে থাকে, উচ্চকোটির সমাজে তা অনুপস্থিত। দরিদ্র ঘরে আত্মহত্যা বাড়ছে দারিদ্রের জ্বালায়। আর উচ্চবিত্ত ঘরে বাড়ছে পাশে কেউ না থাকার যন্ত্রণায়। যত দিন যাবে, এই অসুস্থ পুঁজিবাদী সমাজ মানুষকে আরও একা করে দেবে। বাড়াবে অবসাদ, আত্মহত্যা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

কমরেড শিবদাস ঘোষ রচনাবলি
পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে

সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক চিন্তা সিলেবাসে ঢোকাতে চাইছে বিজেপি সরকার

এআইডিএসও-এর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ ৪ এপ্রিল সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একটি বিবৃতিতে জানান, এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় যে, এনসিইআরটি বিজেপির চূড়ান্ত বিভেদমূলক, সাম্প্রদায়িক ও অসহিষ্ণু রাজনীতির সুরেই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাস, সিভিক, হিন্দি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্য বইয়ের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এইভাবে তারা যুক্তিসঙ্গত চিন্তা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরুদ্ধে এক অপরাধ সংগঠিত করছেন।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থবিরোধী নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত করতে আরও একবার স্বৈরাচারী কায়দায় অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক পথকেই বেছে নিল। বিজেপি সরকার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বই থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, অতীতের ঐতিহ্য, বৈচিত্র্য সহ বেশ কিছু অধ্যায় বাদ দিয়েছে যেগুলো আমাদের ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ। ২০২৩-২৪ নতুন শিক্ষাবর্ষে ইতিহাসের গণতান্ত্রিক রাজনীতি (সিভিক) অংশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে 'গণতন্ত্র এবং বৈচিত্র্য', 'গণসংগ্রাম ও আন্দোলন', 'গণতন্ত্রের সামনে নানা চ্যালেঞ্জ' এবং ভারতের ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে 'মুঘল শাসক ও তাদের দরবার', 'ঔপনিবেশিক দেশভাগ' পরিচ্ছেদগুলি।

একইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'ঔপনিবেশিক শহর', 'দেশভাগ' বিষয়গুলিও আর পড়ানো হবে না। দ্বাদশ শ্রেণির পৌরবিজ্ঞান থেকে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগ'কেও বাদ দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে গণআন্দোলনের উত্থান, এবং 'একদলীয় শাসনের সময়কাল'ও আর পড়ানো হবে না। একাদশ শ্রেণির হিন্দি পাঠ্যবই থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ফিরাক গোরখপুরীর গজলের কিছু উদ্ধৃতাংশ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি নিরালার কবিতা, 'চার্লি চ্যাপলিন ইয়ানি হাম সব', গজানন মাধব মুক্তিবোধের 'নয়ে জনম কি কুন্দালি', নরেন্দ্র শর্মার 'নিন্দ উচত জাতি হ্যায়' লেখাগুলি। এইভাবে বিজেপি সরকার ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সামগ্রিক ধারণার প্রতি তাদের অসহিষ্ণুতাকেই প্রকট করেছে।

সৌরভ ঘোষ বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তার বিভেদমূলক ও সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রচার করতে স্কুলপাঠ্য বইকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে যে ভাবে ব্যবহার করছে, তা সভ্যতার বিরুদ্ধে এক চরম অপরাধ। বিজেপি সরকার জঘন্য উদ্দেশ্য এবং পূর্ব পরিকল্পনা মতো ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। এইভাবে অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে শিক্ষার উপর একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার এনসিইআরটিকে দিয়ে এই জঘন্য কাজগুলি করাচ্ছে। সরকার এইভাবে যুক্তিবোধহীন, রোবটের মতো প্রজন্ম তৈরি করতে চাইছে যারা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকবে।

অন্য দিকে, ধর্ম বর্ণ জাতিকে ভিত্তি করে অসম্প্রীতির ভাবনাকে এমন ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যা পরিণতিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম দিচ্ছে। এই রকম পরিস্থিতিতে সরকারের শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবেই প্রগতিশীল অধ্যায়গুলিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাদ দেওয়ার ঘটনা শুধু সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেই নয়, গোটা সমাজ জুড়েই সাম্প্রদায়িক এবং বিদ্বেষী মনোভাবের জন্ম দেবে। এটা গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার উপরে অপ্রত্যাশিত আঘাত। তাই এআইডিএসও শিক্ষাবিদ, সাধারণ মানুষ, অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পাঠ্য বইয়ের এসব স্বেচ্ছাচারী পরিবর্তনের বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে একত্রিত হওয়ার আবেদন জানাচ্ছে।

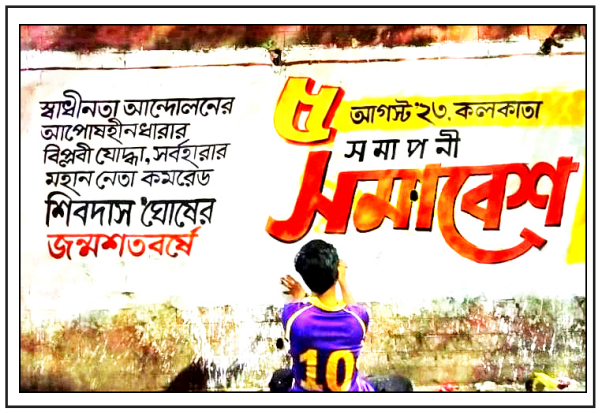

মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছে সাধারণ মানুষ

শিয়ালদহ-বেলেঘাটা রুটে অটোতে যেতে যেতে শুনলাম এক জন আর এক জনকে বলছেন, আগুন লেগেছে আগুন। তীব্র গরমের তাত, না আশেপাশে কোথাও আগুন লেগেছে? কান পাততে শুনলাম মূল্যবৃদ্ধির আগুনের কথা বলছেন এক ছোট ব্যবসায়ী ও তাঁর সঙ্গী। বৈঠকখানার পাইকারি বাজারে রসুন-পেঁয়াজ-আদা কিনে তিনি পাড়ায় বিক্রি করেন। তা কিনতে গিয়ে পকেট ফাঁকা। পাশের আসনে বসা যাত্রী বললেন, কী খাব বলুন তো! বাজারে গিয়ে চরকিপাক খেলেও একটা সব্জি কিনতে পারছি না। চালের দাম বেড়েই চলেছে। বেড়েছে সব রকম ডালের দাম।

বাস্তবে গরিবের শুধু ডাল-ভাতও জোটা মুশকিল এই আগুন-মূল্যে।

বাজারে গেলেই যেন আগুনের ছেঁকা লাগছে। গরমকালের সবজি পটল-ঢেঁড়সের দাম আকাশছোঁয়া। বেশিরভাগ সব্জির দাম ৬০-৭০ টাকা। তার নিচে সব্জি প্রায় নেই বললেই চলে। মাছ-ডিমেরও দাম চড়া। সন্তানদের পাতে কী দেব— এই ভেবেই বহু পরিবারে বাবা-মায়ের ঘুম উড়ে যাচ্ছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতেও সরকার ও প্রশাসন অদ্ভুত ভাবে নীরব। তাঁরা একেবারে গুরুত্বহীন নানা ঘটনায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেন সংবাদমাধ্যমের সামনে, রাজ্যবাসীর উদ্দেশে উপদেশমূলক বাণী বিতরণ করেন, অথচ এরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁরা সব নিখোঁজ। মূল্যবৃদ্ধি চড়া হলে প্রতি বছর সরকার 'টাস্ক ফোর্স' নামক যে কুমিরছানা বের করে মানুষের ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করে, তার হদিশও পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। যদিও সেই টাস্ক ফোর্স কী 'টাস্ক' করে তা নিয়ে ভুক্তভোগীরা যথেষ্ট সন্দিহান।

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা আইন রয়েছে। রয়েছে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা। কিছুদিন আগেও গণবন্টন ব্যবস্থায় চাল-গম ছাড়াও চিনি-ডাল সহ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিছুটা কম দামে রেশন দোকান থেকে মানুষ পেত। এখন শুধু চাল, তাও প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। গম সরবরাহ বন্ধ। কারণ হিসাবে গমের উৎপাদন কম দেখানো হচ্ছে, অথচ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভারতে গম উৎপাদন হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার (১১২ মিলিয়ন টন) থেকে বেশি। তাহলে এই বিশাল পরিমাণ গম যাচ্ছে কোথায়? আসলে ইউক্রেন নানা দেশে গম রপ্তানি করত। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সেই বাজার দখলে নেমে পড়েছে ভারতের খাদ্যপণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা। তারা রেকর্ড পরিমাণ গম বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর, তুরস্ক সহ নানা দেশে রপ্তানি করছে। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য গম নেই। চালও যে কোনও সময় বন্ধ করে দিতে পারে সরকার, রেশনে দিনের পর দিন চালের পরিমাণ কমায় এই আশঙ্কা করছেন গ্রাহকরা। অথচ চাল উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়, চিনের পরে (মার্চ, ২০২৩)। চাল-গম-ডাল-দানাশস্য উৎপাদনে ভারত শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। ভারতের মতো দেশ যেখানে চাহিদার থেকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশি, সেখানে সাধারণ মানুষের হাতে এগুলি পৌঁছচ্ছে না কেন? কারণ সরকারের জনগণের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ববোধের অভাব এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রতি দায়বদ্ধতা।

খাদ্যদ্রব্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির কারণ কী? নেতা-মন্ত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য এবং সব্জির দাম বাড়ার জন্য আবহাওয়াকে দোষারোপ করে দায়মুক্ত হন! আবহাওয়া সাময়িক মূল্যবৃদ্ধির কারণ হতে পারে, কিন্তু লাগাতার চড়া দামের কারণ কী? আসলে এখন খাদ্যদ্রব্যের বাজারটি পুরোপুরি বৃহৎ পুঁজিপতিদের কব্জায়। সরকার তথা রাষ্ট্রের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। উল্টে কর্পোরেট কোম্পানিগুলির লুটের জন্য খাদ্যপণ্যের বাজারকে তুলে দিয়েছে সরকার। আদানি থেকে শুরু করে নানা বহুজাতিক কোম্পানি দখল করে রেখেছে এই বাজার। বিগত কৃষি আন্দোলনের সময়েই ধরা পড়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি জনবিরোধী কৃষি আইন আনছে এ কথা যেন আগে থেকে জেনেই আদানি, আইটিসি-র মতো গোষ্ঠীগুলি বড় বড় অত্যাধুনিক গুদাম, হিমঘর নানা রাজ্যে বানিয়ে ফেলেছে। যাতে কৃষি ফসলের বেশিটাই তারা মজুত করতে পারে। আন্দোলনের চাপে কৃষি আইন বাতিল হলেও নানা পথে তাদের হাতেই ফসলের অধিকাংশটা যাতে যায় তার তদারকি করছে কেন্দ্র এবং নানা রাজ্যের সরকার। প্যাকেটজাত ব্র্যান্ডেড খাদ্যদ্রব্য চড়া দাম দিলে অনায়াসেই পাওয়া যাচ্ছে। শপিং মলে এগুলির বিক্রি চলছে রমরমিয়ে। এভাবে জিনিসপত্রের লাগামছাড়া দামবৃদ্ধি করে মুনাফা লুটছে তারা। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা না ভেবে খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা করছে বেসরকারি কোম্পানিগুলি এবং সরকার তার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে।

সরকার ইতিমধ্যেই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ৭৯২টি বেসরকারি প্রকল্পকে অনুমোদন দিয়েছে এবং তাদের ৫ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা দিয়ে উৎসাহিত করেছে (২০২১-এর জুলাইয়ে সংসদে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রহলাদ সিং প্যাটেলের বয়ান)। বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে চুক্তি-চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রেও মুনাফাখোর কালোবাজারি-ফড়ে-মজুতদারদের রমরমা। এরা এখন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। চাষির বিক্রি করা ফসলের বেশিরভাগটা কিনে নেয় এরা, তারপর মজুত দ্রব্য অফ-সিজনে কয়েক গুণ বেশি দামে বিক্রি করে। সমস্ত সঞ্চয় খরচ করে বা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে চাষ করেও কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পায় না, তাদের অভাবি বিক্রিতে বাধ্য করা হয়। ঋণ শোধ করতে না পেরে কৃষক আত্মহত্যা করে। অতি-উৎপাদন বা স্বল্প-উৎপাদন দুটোরই সুযোগ নেয় এই চক্র। ক্ষমতাশালী দলগুলি এদের মদত দেয়। চাষি আত্মহত্যার পথে যেতে বাধ্য হয়, অন্য দিকে চড়া দামে খাদ্যদ্রব্য কিনতে বাধ্য হয় সাধারণ মানুষ। বছরের পর বছর মূল্যবৃদ্ধির সাথে পাঞ্জা কষতে হয়, খাবারে কাটছাঁট করতে হয় তাদের। এভাবেই বহুজাতিক পুঁজিপতি-মজুতদার-শাসক দলের অশুভ চক্র মূল্যবৃদ্ধিকে অনিবার্য করে তুলেছে।

সরকার যদি মানুষের প্রতি এতটুকু দায়বদ্ধতা অনুভব করত তা হলে খাদ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসা ক্রমাগত একচেটিয়া মালিকদের হাতে না ছেড়ে এগুলি উৎপাদন থেকে বন্টন এবং বিক্রি সবটাই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের আওতায় আনত। একমাত্র এই পথেই সম্ভব ছিল মূল্যবৃদ্ধির আগুন থেকে মানুষকে বাঁচানো। তাই এই দাবিকে জোরদার করাই আজ সময়ের ডাক।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com